শান্তিনিকেতন

(চতুর্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
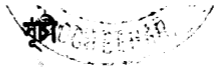
কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্তলাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্ম্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিষ—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনো-কালেই মানুষ পৌঁছবে না, সে গৃহকে মান্‌লেও

হয়, না মান্‌লেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বল্লে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম্মশেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখেনা, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য্য আমাদের থাম্‌তে দেয় না;—কিন্তু দুর্গতির পূর্ব্বে দেখ্‌তে পাই মানুষ বল্‌তে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম্ম সে বিসর্জ্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কি করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায় সেই কথাই সে ভাব্‌তে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিষটা যে কেবলি সরে, কেবলি সরায়। এখানে হয় সরতে থাক, নয় মরতে থাক। এখানে যে বলেচে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধ্‌ব সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড় বড় জাতির মধ্যেও দেখ্‌তে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্ম্মনীতিকে দুর্ব্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা

হয় সে কারো অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলি উন্নতি, কেবলি গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থাম্‌তে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! একথা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু একথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বল্‌তে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্চে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে

আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে ত সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মত এতে আমরা বিনষ্ট হইনে। তার কারণ আমরা পূর্ব্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরো গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার

দরুণ তিনি আমাদের কাছে ছোট হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কি বল্‌ব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"—ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনো-কালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্তেই ভারত-বর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

সেইজন্যে মৃত্যুর দিক্ থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করে-ছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড় বলে ত বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপ-নাকে বড় করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহঙ্কার করবার কিছুই রাখেনি সেই ধন্য—কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেঽস্তু" —তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

"জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান॥

২৫শে পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্চে—সৌন্দর্য্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করচে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমুহূর্ত্তে সমগ্র করে দেখ্‌তে পাইনে। প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখ্‌তে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি

পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোট করে এবং নিকটকে বড় করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড় করে ও দূরকে ছোট করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপ্সা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এই জন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ঙ্কর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখ্‌ছিলুম। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্ব্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা

বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব —এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্য্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আস্‌তে হচ্চে। এমন কি, তার যথাসর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মত জান্‌ত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাক্‌বেনা সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

একথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে

একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক্ থেকে এসে তার মর্ম্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়. তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জ্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেল্‌ত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলি বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং

আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক্ আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক্ আমি একাধিপত্য করি। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্ম্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্ম্মের পাঠ একেবারে তুলে দেয়, নানা-প্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্ম্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়; মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিক্‌কে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি!

২৬শে পৌষ

কর্ম্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্ম্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংশ করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এ'কে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম। যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্চে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করচে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করচে তাঁকে জানতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ?

এক দিকে কর্ম্ম আপনিই হচ্চে, আর এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বল্‌তে পারিনে, তেমনি তাঁর কর্ম্ম মাকড়ষার জালের মত শামুকের খোলার মত তাঁর নিজেকে বদ্ধ করচে একথাও বলা চলে না।

এই জন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বল্‌চেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্চে।

কর্ম্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে

হয়, আর প্রাচুর্য্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয়, বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যে কর্ম্ম করি সেই কর্ম্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে ত বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্ম্মই মুক্তি।

এই জন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্চে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্ম্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্চে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্ম্মের মধ্যেই তিনি মুক্ত স্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্ম্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা

নয় সেই কর্ম্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্ম্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্ম্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্ম্মে। সমস্ত কর্ম্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্ম্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারে কর্ম্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম্ম অন্ধকার এবং কর্ম্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ তাকে নাস্তিকতা বল্লেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্চে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জ্জিত করে দেখ্‌লে সমস্তকে ত্যাগ করা হয় সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হোক্ আনন্দের ধর্ম্ম যদি কর্ম্ম হয়

তবে কর্ম্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় এ'কেই বলে কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্চে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্ম্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্ম্মকে তিনি স্বামীর কর্ম্ম জেনেই আনন্দবোধ করেন— কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মত এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম্ম তাঁর পক্ষে কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্চেন।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এই কর্ম্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন

হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—"মৃত্যুং তীর্ত্বা"—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জ্জরিত হতে থাকবেন—তিনি "যদ্যৎকর্ম্মপ্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" —যে যে কর্ম্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন, কারণ, কর্ম্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দসাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্ম্মের আসক্তি দূর করে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা

বিসর্জ্জন করে কর্ম্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুল্‌তে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে "কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" কেই ব কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত—জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭শে পৌষ

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সঙ্গত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘট্‌লেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌বে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জ্জন করে নিয়মের ঊর্দ্ধে উঠ্‌ব তা হলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে' তবেই

বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মান্‌তে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বল্‌ছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারি—কর্ম্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্ম্মের চেয়ে বড় হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য কর। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন্‌ তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" শুনেছি এঁর পরমাশক্তি এবং এঁর বিবিধাশক্তি—এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্চে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করচেন, তাঁকে কেউ করাচ্চে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্ম্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্ম্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্ম্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্ত্তিবশত।

সেই কারণে কর্ম্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্ম্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন

ঘট্‌তে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনি সে চলে যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনি সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম্ম যখন স্বার্থের সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্ম্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্ম্মা স্বার্থপর, জগৎ-সংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টান্‌চে এবং

এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মত আয়ত্ত করে রাখ্‌বে এমন সাধ্য তার নেই ; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্ম্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্ম্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্ম্মই করি—তা ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্ সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখ্‌লে সেই কর্ম্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম্ম সত্যকর্ম্ম, মঙ্গল কর্ম্ম এবং আনন্দের কর্ম্ম হয়ে উঠ্‌বে।

২৮শে পৌষ

——

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ—ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান্।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্ম্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধটুকু তুল্‌লেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী"

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্চেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম্ম এই দুটো জিনিষ একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের

সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করচেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না ত, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্ম্মও কর্ব্বেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি ত শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা ত নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বল্‌লে তাঁর আনন্দ বাঁধ মান্‌বে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বল্‌তে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বল্‌তে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা,

স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্ব্বতো-ভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বল্‌চেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝঙ্কৃত করে তিনি বল্‌ছেন—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্ম্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বল্‌চেন, আপন অমৃত সঙ্গীত বল্‌চেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বল্‌বেন তখন আর-কেমন করে বল্‌বেন? তাঁকে কর্ম্মের দ্বারাই বল্‌তে হবে? তাঁকে ক্রিয়াবান্ হতে হবে।

সে কর্ম্ম কেমন কর্ম্ম? না, যে কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ"

পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্ম্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্ম্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলচেন—"শান্তম্ শিবম-দ্বৈতম্।" জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করচে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্ম্মে উচ্ছ্বসিত হচ্চে, বাহিরের সেই কর্ম্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্চে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সুন্দর আবর্ত্তন চলচে

এবং সেই আবর্ত্তনবেগে নব নব মঙ্গল লোকের সৃষ্টি হচ্চে। সেই আবর্ত্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্চে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠ্‌চে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণ-রূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্ম্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধূলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজ্‌তে থাকুক্—কর্ম্ম সঙ্গীতে বাজ্‌তে থাকুক্—তোমারি নামে বাজ্‌তে থাকুক্! প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় ত সেও ভাল কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক্, গভীর হোক্, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে

সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক্—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হোক্!

২৯শে পৌষ

——

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্ম্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্ব্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্ম্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে

একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বল্লেন অথচ কর্ম্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড় পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরান্ত, তিনিই যে ছোট সে কথাও নানারূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘট্‌ল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নির্গুণ দিক্ এবং একটি সগুণ দিক্ দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্য থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক্।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করিনি। তখন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুসি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্চে তা এমনি একতরফা হচ্চে যে আমার দিক্ থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্চে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলি সকলের হাত পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বল্‌তে হয় তুমি দয়া করে জ্বল, বাতাসকে বল্‌তে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্য্যকে বল্‌তে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচেনা। "অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ"—যেখানে ব্যবস্থা

দেখ্‌তে পাইনে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না—কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবী নেই—সেটা একেবারেই এক তরফা জিনিষ।

অথচ যার সঙ্গে এতবড় কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও ত কোনো নিয়ম থাক্‌তে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুক্‌তাক্‌ বলে তাই সে আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে চায়, সেই তুক্‌তাক্‌ যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই ত বোঝাতে হয়! কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ী থাকা। সেও আবার এমন পর যে

খামখেয়ালিতার অবতার। হয় ত পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয় ত হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনি ঘর ছেড়ে বেরতে হবে।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথ-শায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগুনে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্য্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেন না, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারি। তার নিজের যে আলোক

সর্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত!

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর ত বাধা পেল না। সে বল্‌ল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন! আর ত আমাকে সঙ্কুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না! এতদিন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম যেন কোন্‌ পাগ্‌লাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন সমস্তই আমার আপনার।

এই ত হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজের শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন

সেই পরিচয়ের উপরেই ত চুপচাপ করে বসে থাকতে পারিনে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্ব্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায় —কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্চে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে' আর চুপ করে' থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্ম্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্ম্মের দ্বারা সে নিজেকে

দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জ্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মত থেকে কেবলি বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তি-কেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্চে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্ম্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্ম্মই হতে পারবে না।

তা কি করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্চেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেই জন্যেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্ব্বতীর মত তিনি তপস্যা করচেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন

তখনি আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্ত্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয় —তারও পরের কথা হচ্চে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জ্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই ত তাকে মুক্তি বল্‌ব— নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১লা মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাব্‌তে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে— মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় তত খানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেষ্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড় বড় উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ

হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানব হৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্চে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজন-ওয়ালা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে ত কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্ত্তি দেখেই ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়। ম্যাঞ্চেষ্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কি!

আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব! বাণিজ্যের জাহাজ দেশবিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকৃব!

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এতবড় স্পর্দ্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্ খানে? প্রেমে। যখনি জানৃব প্রয়োজনই মানব সমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্ত্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনি বলে উঠৃব—প্রেম! আঃ বাঁচা গেল! তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারি জিনিষ। এ ত আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে ত আমারি তত্ত্ব।

অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্ত্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই ত গেল মুক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্চে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার ত ওজর নেই। সে ত বল্‌তে পার্ব্বেনা, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই যেখান থেকেই ডাক পড়ে তার আর না বল্‌বার জো নেই। মুক্তির এত বড় দায়। আনন্দের দায়ের মত দায় আর কোথায় আছে!

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদ্‌চে। সে বল্‌চে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত, গর্ব্বিত, স্বতন্ত্র সেই খানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও! যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্চে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কি ঘোরাই ঘুরেছি! আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি! যখনি স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছো—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনি এক মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু ত মুক্তিলাভ নয়।

তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১লা মাঘ

—

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জান্‌তেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক একটি মতবাদকে

আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোট এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্যে সত্যকে বারম্বার মতদেহ পরিবর্ত্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে ; তখন তার নানা প্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘট্‌তে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা, যে, কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায়

আমরা ভীত ও পীড়িত হইনে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানাদেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করচে এক একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্যআত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহলেই সত্যের অমৃত স্বরূপ জান্‌তে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলি মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহঙ্কার সুতীব্র হয়ে উঠে' জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে' সত্যকে যতই দূরে ফেল্‌তে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমা-

ষের ধৈর্য্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্য্য হরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্য্যন্ত এক-ঘরে' করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ কর! তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানিনে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বল্‌চে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি-লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে একেবারে পর্য্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্ত্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্য্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরি-সমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বল্‌চি এ'কে

অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য্য থাকৃত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করচে একদিকে আচ্ছন্নও করচে। যেদিকে আচ্ছন্ন করচে সেদিকে তাকে কি বল্‌ব? তাকে মায়া বল্‌ব না কি, মিথ্যা বলব না কি? তবে "মিথ্যা" শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই স্তব্ধ শান্ত গম্ভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতি-লাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাইনে।

কেননা, আমি যে অনুভব করচি, মিথ্যার

বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখ্‌তে পাচ্চি, যে পদার্থটাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্চি— যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেল্‌তে পারিনে! অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে! মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ।"

নিজের অহঙ্কারকে, নিজের স্নেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্চি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টান্‌ব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জান্‌চি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎসম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্চে না? সেই ভ্রমই কি

আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করচে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়ষার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহঙ্কারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জ্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি!

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মত থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌চে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে! আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—"একমেবাদ্বিতীয়ং!"

২রা মাঘ

নির্ব্বিশেষ

সংসার পদার্থ টা আলো আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ শক্তি বিপ্রকর্ষণ শক্তি, কেন্দ্রানুগশক্তি কেন্দ্রাতিগশক্তি কেবলি বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু "এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত" সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখ্‌তুম—শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখ্‌তুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে

অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চল্‌তে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চল্‌লে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাক্‌বে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে ·সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এইপ্রকার সোজা লাইন থাক্‌তে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চল্‌তে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টান্‌তে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চল্‌তে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বত্ব নেই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব্ব পশ্চিমের

মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্ব্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিষটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কি নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনি ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌তে যাই তখনি এ'কে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্ব্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অদ্বৈতের বিরাট্ সাধনা, ছোট বড় নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। এ'কেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জান্ত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহঙ্কারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্ম্ম করতেই পারে। মানুষের ধর্ম্ম-বোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্চে তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চল।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট

মূর্ত্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অটাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারিনে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড় বড় ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্ম্মভাব কত রকম করে কাজ করচে। বড়র মধ্যে ছোটর বিশেষত্ব গুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জন্যে বড়র মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড় ভাবের আনন্দে ছোটর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্চে নির্ব্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করচে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের

এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদদান করেছে—তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্দ্ধব্যক্তভাবে যে সত্য কাজ করছিল; সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হোক্ বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে সয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে ত কোনমতে মনেও করতে পারিনে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত যা কিছু

হচ্চে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্ব্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছন যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে পারে না। কর্ম্ম তখন আনন্দের কর্ম্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্ম্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩রা মাঘ

দুই

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধ
মপাপবিদ্ধং
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসচিঃ —

"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।"

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তাউদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করিনি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখ্‌তে পেতুম। "তিনি সর্ব্বব্যাপী" এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—"স পর্য্যগাৎ"; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞা গুলি "শুক্রং" "অকায়ং" প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েচে। দ্বিতীয়তঃ, শুক্রম্‌ অকায়ম্‌ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ "কবির্ম্মনীষী" প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের

শরীর নেই এই পর্য্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বল্‌লে এক ত বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত-করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক্ দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারিনি।

আমি সে জন্যে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিষকে তখনি লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্ব্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্ব্বে আমি দেখ্‌তে পাইনি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্চে "পর্য্যগাৎ" তিনি সর্ব্বত্রই গিয়েছেন সর্ব্বত্রই আছেন—আর একটি হচ্চে "ব্যদধাৎ" তিনি সমস্তই করেচেন। এই মন্ত্রের এক অর্দ্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্দ্ধে তিনি করচেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ পদ, যেখানে করচেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ, অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্ব্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখ্‌তে হয়। তিনি যে

কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্ব্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্ব্বত্র নেই। শুধু সর্ব্বত্র নেই তা নয় সে সর্ব্বত্র নির্ব্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্ম্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুণ কি বলা হল তা ঐ অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই ত গেল সপর্য্যগাৎ।

তার পরে স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্য্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করচেন এবং নিত্য কালের জন্য বিধান করচেন। সে বিধান কিছু-মাত্র এলোমেলো নয়—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করচেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কি? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্ব্বদর্শী কথাটা ঠিক চলেনা। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখ্‌চেন তা নয় তিনি করচেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অথাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করচে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখ্‌লেই টের

পাওয়া যায়। জগৎ প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্ব-মানবের মন যে আপনাআপনি যেমন তেমন করে একটা কাণ্ড করচে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্চেন পরিভূ :—কি জগৎ-প্রকৃতি কি মানুষের মন সর্ব্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর এই কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্চে না তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্ম্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য দুইবাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও

সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাতথ হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্ব্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাক্‌বে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাক্‌বে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুল্‌বে—মনকে রাজ্য করে তুল্‌বে—বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে; অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভূত্ব সুস্পষ্ট হবে—অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম্ম কেমন মিলিত হয়েছে—হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভূ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বহুধা হয়ে উঠেছে—বিশুদ্ধ নির্ব্বিশেষ

বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন—যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করচেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ঐ একটি ছোট মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ঠা মাঘ, কলিকাতা।

বিশ্বব্যাপী।

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ—
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায়
নমোনমঃ।—

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ব-ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ একথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, "তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারিনে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়—একথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু একথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বল্‌তে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুন্‌লে চলেনা—এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিষকে আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিষটা যে কেবল নিজে

ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের সামিল হয়ে ওঠে। কেরাণী তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বল্লেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানা প্রকার সুবিধা ঘটচে তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখ্‌তে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহঙ্কৃত

হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড় করে পেতুম তাকে ছোট করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ করে দেখেননি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মত গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী এই জ্ঞানকে

সর্ব্বত্র সার্থক কর—যিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক্‌।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখোনা, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ কর—দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্দ্ধে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ কর—তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্চে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্ব্বব্যাপী ধীকে ধ্যান কর—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ কোরোনা। সমস্তই আশ্চর্য্য, সমস্তই পরিপূর্ণ;—নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্ব্বত্রই মাথা নত হোক্‌ হৃদয় নম্র হোক্‌, এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক্‌; যাকে বিনামূল্যে পেয়েছি তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ কর, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ্‌ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও!

“য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়

নমোনমঃ”—পূর্ব্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোট করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল?

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি—একথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে ঋষি বলেছেন, তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন—সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর

তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে স্নান কর্তেন সে স্নান কি পবিত্র স্নান, কি সত্য স্নান, তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কি অমৃতের স্বাদ ছিল—তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্য্যোদয় কি গভীর গম্ভীর কি অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্য্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চল্‌বেনা—কবে বল্‌তে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ই মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের

সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত—এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ—এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম্ম অতি বিচিত্র—এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হননি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হননি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেননি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে

সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই—তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্চে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে

আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকেনা। তাঁর পার্থিবজীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেই জন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্ম্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এই জন্য. তাঁর মৃত্যু দিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অত্তকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃত জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল—

৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না— তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি—সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ই মাঘ কলিকাতা